কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

ইচ্ছাশক্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

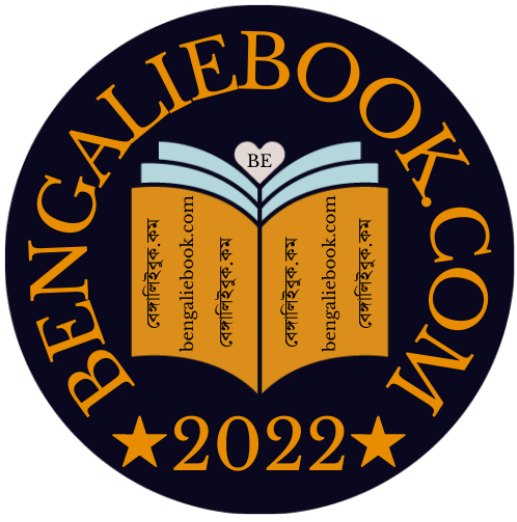

ইচ্ছাশক্তি

মহাশূন্যের আর্মস্ট্রং স্টেশনের ওপরে ঘুরছে ঝিলমদের রকেট।

এর আগে ঝিলমরা এখানে এসেছে অনেকবার। প্রত্যেকবারই এসেছে আনন্দ ভরা মন নিয়ে। আর্মস্ট্রং স্টেশন চমৎকার জায়গা। এখানে এলেই মন ভালো হয়ে যায়। মহাশূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেই ইচ্ছে করে দু-একদিন আর্মস্ট্রং স্টেশনে কাটিয়ে আসতে। এখানে নাচ, গান, হই-হল্লা, যে-কোনও পছন্দ মতন খাবার, সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু এবারে এই রকেটের যাত্রীরা এসেছে অনেকগুলো বিপদ কাটিয়ে এবং দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে।

রকেটটা চালাচ্ছে ইউনুস, তাকে সাহায্য করছিল রা। সে মাঝে-মাঝেই চোখের জল সামলাতে পারছে না। নী নামের অল্পবয়েসি মেয়েটি, যে সব সময়েই হাসিখুশি থাকে আর মুখে কবিতা বানায়, সে ব্যাপার-স্যাপার দেখে যেন বোবা হয়ে গেল।

গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে একটা গলা ভেসে এল, রকেট নং তিন হাজার সাতাশ, সুস্বাগতম আমি রাইন বলছি! আর্মস্ট্রং স্টেশনের তিন নম্বর গেট তোমাদের জন্য খোলা হচ্ছে। জীবনটা খুব সুন্দর, তাই না ঝিলম?

ইউনুস একবার ঝিলমের দিকে তাকাল। ঝিলম বসে আছে একটা পাথরের মূর্তির মতন। তার গায়ের রং আগুনের মতন লাল। সত্যি যেন তার গা থেকে আগুনের ছটা বেরুচ্ছে। তার চোখের মণি স্থির। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না!

ইউনুস বললেন, জীবন শুধু সুন্দর নয়, রাইন। জীবন অতি বিচিত্র। আমি ইউনুস বলছি! ঝিলম একটু অসুস্থ হয়েছে। রকেটের কন্ট্রোলে এখন আমি আছি।

রাইন জিগ্যেস করল, কী হয়েছে ঝিলমের?

ইউনুস বলল, সেটা দেখা হলে বুঝিয়ে বলব। রাইন, তুমি ঝটিকা বাহিনীতে তৈরি থাকতে বলো তিন নম্বর গেটে। হাসপাতালে খবর দিয়ে রাখো। ঝিলমকে এক্ষুনি সেখানে ভর্তি করতে হবে।

রাইন ঝিলমের বন্ধু। একথা শুনে বিচলিত হয়ে বলল, কী বলছ, ইউনুস? ঠিক আছে, আমার ডিউটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি নিজে উপস্থিত থাকছি তিন নম্বর গেটে!

ইউনুস বলল, শোনো, আর একটা কথা আছে। আমাদের বন্ধু কমপিউটার জিউস কোনও কথা বলছে না। সুতরাং ঠিক মতন টাচ ডাউন হবে কি না জানি না। তুমি এমার্জেন্সির ব্যবস্থা রেখো।

রাইন বলল, সে কী! তোমাদের কমপিউটার কাজ করছে না? ঘুমিয়ে পড়েনি তো। জাগাবার চেষ্টা করে দেখেছ?

ইউনুস বলল, হ্যাঁ দেখেছি। ও জাগবে না, ওর হার্ট বীট থেমে গেছে।

তা হলে নেমো না, এখন নেমো না! ওপরে ঘুরতে থাকো!

কতক্ষণ ঘুরব, আমাদের ফিউয়েল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সর্বনাশ! কিন্তু কোনও উপায় নেই, ইউনুস। আর্মস্ট্রং স্টেশনে ফোর্সড ল্যান্ডিং নিষিদ্ধ। কমপিউটার খারাপ হলেও নামতে দেওয়া হয় না। এখানে কোনও রকম বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

তা হলে আমি কী করব?

তুমি যেমন ভাবে পারো রকেটটাকে ভাসিয়ে রাখো! যেটুকু ফিউয়েল আছে তা দিয়ে সোজা ওপরে উঠে যাও, তারপর আস্তে-আস্তে নামো! তার মধ্যেই ব্যবস্থা হচ্ছে।

কান্না থামিয়ে রা বললে, ইউনুস, রকেটটা হালকা করার জন্য আমি প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারি।

ইউনুস বলল, রা, তুমি ভুলে গেছ, আমাদের অম্লজান ট্যাবলেট সব শেষ। এমনি এমনি রকেটের বাইরে যাওয়ামাত্র তোমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

রা কপাল চাপড়ে বলল, উঃ, এক সঙ্গে এতগুলো বিপদ!

ইউনুস বলল, রা, ধৈর্য ধরো। তুমি নী-কে সামলাও, দ্যাখো, নী কাঁপছে!

নী রা-কে জড়িয়ে ধরে বলল, রা-দি, আমি আমাদের জন্য ভয় পাচ্ছি না! কিন্তু ঝিলমদার কী হবে? ঝিলমদার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না! দ্যাখো, চামড়া দিয়ে একটু-একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভেতরে কিছু পুড়ছে।

রা ঝিলমের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখে হাত চাপা দিল।

ইউনুস অনেকটা ওপরে উঠে এসে রকেটের সব কটা বুস্টার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে পাখির মতন ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশিক্ষণ এই ভাবেও থাকা যাবে না। আর্মস্ট্রং সেক্টারের পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইল, তার একটা মাধ্যাকর্ষণ

আছে, সে টানছে।

ঠিক চার মিনিটের মধ্যে দুটি রেসকিউ রকেট উড়ে এল নিচ থেকে। তারা ইউনুসের রকেটের দুদিকে জয়েন্ট করলে।

ইউনুস দরজা খুলে দিতেই তিনজন উদ্ধারকারী ঢুকে পড়ল। তাদের মধ্যে একজনকে ইউনুস আগে থেকেই চেনে। তার নাম জুভ। মোটা-সোটা চেহারার অতি ভালো মানুষ।

জুকভ প্রথমে মহিলা দু-জনের দিকে তাকিয়ে মাথায় টুপি ছুঁয়ে অভিবাদন জানাল।

তারপর ইউনুসকে বলল, তোমাদের জীবন আনন্দময় হোক, ইউনুস। আর চিন্তা নেই। তোমরা আমাদের রকেটে ঢুকে পড়ো। এই রকেটের ভার আমরা নিচ্ছি।

অন্য একজন ঝিলমের দিকে তাকিয়ে বলল, এ কী! ওই লোকটি যে জ্বলছে।

জুকভ বলল, এ কে ইউনুস?

ও ঝিলম! ওর একটা বিপদ হয়েছে!

ঝিলম? চেনাই যাচ্ছে না! ওর গা থেকে আগুন বেরুচ্ছে কেন?

একজন উদ্ধারকারী বলল, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনারা পাশের রকেটে যান। কিন্তু ওই লোকটিকে তো নেওয়া যাবে না আর্মস্ট্রং সেন্টারে?

রা আর ইউনুস প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল, সে কী! কেন নেওয়া যাবে না।

জুকভ দুঃখিত ভাবে বলল, তাই তো! আর্মস্ট্রং-এ কোনওরকম আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ! ঝিলমকে নিয়ে যাই কী করে? ওর গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

রা বলল, আমস্ট্রং-এ আগুন নিষিদ্ধ? কে বলেছে? ওখানে যে আমরা কত রকম রান্না খাই!

জুকভ বলল, হে মাননীয়া, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন। আর্মস্ট্রং-এ সত্যিই কক্ষনো আগুন জ্বালানো হয় না। সমস্ত রান্না-বান্না হয় মাইক্রোওয়েভে।

ইউনুস বলল, শোনো জুকভ, ঝিলমের গা থেকে যা বেরুচ্ছে, তা আগুন নয়, অন্য কিছু। আগুনের মতনই দেখাচ্ছে যদিও। কিন্তু ওরকম ভাবে আগুনে পুড়লে কেউ বাঁচে? ওর গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো, গা-টা ঠান্ডা!

জুকভ এগিয়ে গিয়ে ঝিলমের গায়ে হাত দেওয়াতেই ঝিলম একটা হাত তুলে তাকে একটা ধাক্কা মারল। অত বড় চেহারা নিয়েও সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল জুকভ!

নী চেঁচিয়ে বলল, ঝিলমদা, এরা আমাদের শত্রু নয়। বন্ধু! এরা আমাদের উদ্ধার করতে এসেছেন।

ইউনুস বলল, ও কিছু শুনতে পাচ্ছে না!

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েও জুকভ কিন্তু রেগে গেল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, ওর গাটা ঠান্ডা! ওকে নেওয়া যেতে পারে।

একজন উদ্ধারকারী বলল, আমি দুঃখিত, মাসাল জুকভ। ঠান্ডা হোক, গরম থোক। ওর গা থেকে আগুন বেরুচ্ছে, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই অবস্থায় ওকে নিচে নিয়ে গেলে আইন ভঙ্গ হবে!

ঝিলম হঠাৎ হেসে উঠল হা-হা করে। লোহার শিকলের ঝংকারের মতন সেই হাসির শব্দ। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে লাগল দরজার দিকে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা মানুষের মতন নয়, খারাপ হয়ে যাওয়া রোবটের মতন।

রা আর্ত গলায় বলল, ওকে আটকান, আপনারা ওকে আটকান।

কেউ কিছু করবার আগেই ঝিলম পৌঁছে গেল দরজার কাছে। অন্য রকেটটি গায়ে-গায়ে লেগে আছে। ঠিক যেমন পা দিয়ে নৌকো সরিয়ে দেওয়া হয়। সেইরকম ভাবে ঝিলম অন্য রকেটটির গায়ে একটা লাথি মারল। অসীম তার ক্ষমতা! অন্য রকেটটি একটু সরে যেতেই ঝিলম ঝাঁপ দিল শূন্যে।

রা আর নী একসঙ্গে কেঁদে উঠল।

জুকভ চোখ বুজে ফেলে বলল, ইস, ছি-ছি-ছি! ঝিলম এত ভালো ছেলে, এরকম দুঃসাহসী অভিযাত্রী আমি খুব কম দেখেছি। তার এই পরিণতি! সব শেষ!

ইউনুসই একমাত্র ঘাবড়াল না। সে বলল, রা তুমি এরকম করছ কেন?

মিডাস নক্ষত্রের কথা মনে নেই? ঝিলমের কিছু হবে না?

তারপরই সে বেতার-টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, রাইন, রাইন! খুব জরুরি, তুমি শুনতে পাচ্ছ? ঝিলম একলা নেমে পড়েছে, তোমরা ওকে গুলি করার চেষ্টা করো না...

রাইন বলল, একলা নেমে পড়েছে মানে? প্যারাসুট ডাইভ? এখানে একটা ফোর্স ফিল্ড আছে জানো না? সোজা আছড়ে পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে!

ইউনুস বলল, ঝিলমের সেসব কিছু হবে না। ঝিলম সেসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে। আমি শুধু বলছি, ওর গায়ে আগুন জ্বলছে তোমরা দেখতে পাবে। কিন্তু ওটা আগুন নয়। ওর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করো না। বন্ধুত্বের দিব্যি দিলাম। তুমি ঝটিকা বাহিনীকে জানিয়ে দাও!

তারপর সে জুকভের দিকে ফিরে বলল, শিগগির চলুন!

.

০২.

রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল লী পো আজই পৌঁছেছেন আর্মস্ট্রং সেন্টারে। গত শতাব্দীর প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গ্যাগারিন-এর নামে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে মঙ্গলগ্রহে, তিনি সেটা উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন। তারপর ভিনাসে যাওয়ার পথে তিনি এখানে থেমেছেন দু-দিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

জেনারাল লী পো-র বয়স হয়েছে। দুপুরে তিনি একটু ঘুমোতে ভালোবাসেন! তা ছাড়া অনেকদিন বাদে তিনি এখানে ভালো-ভালো আসল জাপানি খাবার খেয়েছেন।

তার ঘুম ভাঙিয়ে শান্তি বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার একটি চমকপ্রদ খবর দিল।

আকাশ থেকে একজন মানুষ নাকি এখানে একা-একা নেমেছে। আগুন বেরুচ্ছে তার গা দিয়ে। কিছুতেই বন্দি করা যাচ্ছে না তাকে। কোনও অস্ত্রই তার গায়ে লাগছে । নীল আর্মস্ট্রং-এর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে নাকি পাগলের মতন হা-হা করে হাসছে।

ঘুম চোখ রগড়াতেরগড়াতে জেনারেল লী পো বললেন, কী সব গাঁজাখুরির কথা শোনাচ্ছ আমাকে। এখানে কোনও আবহাওয়াই নেই, তার মধ্য দিয়ে কোনও মানুষ এমনি-এমনি নামতে পারে? কোনও মানুষের পক্ষে এক মিনিটও বেঁচে থাকা অসম্ভব।

অফিসারটি বলল, সার, তা হলে বোধহয় এ মানুষ নয়, আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। সে বেঁচে আছে।

মানুষ নয়, তবে কী।

অনেকে বলছে, মানুষের মতন চেহারা হলেও আমাদের বিজ্ঞানের অজানা কোনও প্রাণী। কেউ-কেউ বলছে দেবতা!

লী পো ভুরু কুঁচকোলেন!

বহু জায়গা ঘুরে তিনি দেখেছেন যে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হলেও এখনও অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে নানা রকম কুসংস্কার আছে। তারা কেউ মনে করে যে এই মহাশূন্যের কোথাও দেবতাদের বাস। স্বর্গ বলে একটা জায়গা আছে।

তিনি বললেন, চলো তো, দেখে আসি!

আর্মস্ট্রং সেন্টারে মনোরেল চলে চব্বিশ ঘণ্টা। তাতে চেপে যে-কোনও জায়গায় পৌঁছানো যায়।

চঁদে প্রথম যে মানুষটি পা দিয়েছিল সেই নীল আর্মস্ট্রং-এর একটি বিশাল মূর্তি আছে এখানে। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল দারুণ ভিড় জমে গেছে। রক্ষী বাহিনীর লোকেরা ঘিরে রেখেছে মাঝখানের জায়গাটা। সেখানে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের মতন চেহারার একটি প্রাণী। তার শরীর থেকে লকলক করছে আগুনের শিখা।

লী পো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সত্যিই লোকটি আকাশ থেকে নেমেছে?

রক্ষী বাহিনীর প্রধান এসে জানাল, সার, আমরা একে জান দিয়ে বন্দি করবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়েছি, ওর গায়ে লাগেনি। এমনকী গুড়ো করার যন্ত্র চালু করেছি, তাতেও এর কিছু হয়নি। একে বন্দি করার সাধ্য আমার নেই!

লী পো জিগ্যেস করলেন, এ কী কারুর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে?

প্রধান জানাল, না, সার, তা করেনি। কিন্তু ওর গা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, সেটাই তো যথেষ্ট বিপদের কারণ! প্রতি মুহূর্তে এখানকার অমূল্য বাতাস খরচ হয়ে যাচ্ছে!

লী পো এগিয়ে গিয়ে প্রথমে এসপারান্টো ভাষায় জিগ্যেস করলেন, হে আগুন্তুক, আমি শান্তি বাহিনীর অধ্যক্ষ, গ্রহ-গ্রহান্তরে, সৌরমন্ডলে, মহাশূন্যে শান্তি আসুক। আপনি কে?

অগ্নিময় প্রাণীটি কোনও উত্তর না দিয়ে হা-হা করে হাসলেন!

লী পো এবারে সরল ইংরিজিতে জিগ্যেস করলেন, আপনি কে?

একই রকম ব্যাপার হল।

তারপর তিনি চীনা, স্প্যানিশ, বাংলা, ল্যাটিন, জাপানি ও সংস্কৃত ভাষায় একই প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন, কোনও কাজ হল না।

এই সময় ভিড় ঠেলে ইউনুস লী পোর কাছে এসে তার বাহু ছুঁয়ে বলল, সার, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

লী পো বললেন, পরে-পরে। আমি এখন ব্যস্ত।

ইউনুস বলল, স্যার, আমি এই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। আমার নাম ইউনুস, আমাকে চিনতে পারছেন না?

লী পো এবারে কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকালেন। বললেন, ইউনুস? হ্যাঁ তোমাকে তো দেখেছি। তুমি বিখ্যাত অভিযাত্রী ঝিলমের বন্ধু। সে কোথায়?

ইউনুস বলল, স্যার আপনি চোখের সামনে ওই যাকে দেখছেন, সেই ঝিলম!

লী পো প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, তুমি বলছ কী, ইউনুস? ঝিলমের এই অবস্থা! আমি যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। ওকে আমি এত ভালোবাসি, অথচ ওর চেহারা দেখে আমি চিনতে পারছি না! তুমি জানো, মিডাস নক্ষত্রে ঝিলম যা করেছে সেজন্য ওকে বিশ্বশান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেই পুরস্কার যে ওর হাতে তুলে দেব, সেজন্য তো ওকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। ওর কী করে এই অবস্থা হল, আমায় বলো!

অনেক কিছু বলতে হবে। এখানে হবে না। স্যার, চলুন, কোনও নিরিবিলিতে যাই।

কিন্তু ও, মানে ঝিলম, এখানে ওই অবস্থায় থাকবে?

ওকে বন্দি করার কোনও উপায় নেই। আমাদের জানা বিজ্ঞানের অনেক বাইরে ও চলে গেছে। চলুন, আপনাকে সবকথা খুলে বলব। ঝিলম এখানেই থাক।

.

০৩.

রা আর নী-কে জোর করেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদের মন এমনই দুর্বল হয়ে গেছে যে এখন খুব বিশ্রাম দরকার। তিন দিনের আগে ওরা জাগবে না।

ইউনুস আর লী পো এসে বসলেন তারাসকোভা উদ্যান-রেস্তোরাঁয়।

মহাশূন্যের ঘোরাঘুরির ধকলের পর গন্ধলেবুর সরবত খেলে অনেকটা চাঙ্গা লাগে। ইউনুস সেই একটা সরবত নিল। লী পো নিলেন এক গেলাস পোর্ট।

ইউনুস বলল, স্যার, মিডাস নক্ষত্রে ঝিলম কী করেছে, তা তো আপনি জানেন। সেখানকার লোকেরা বিচ্ছিন্ন মহাকাশ যাত্রীদের ধরে ধরে চোখের মণি আর কানের পরদা চুরি করছিল। ঝিলম তাদের শাস্তি দিয়ে ওই ব্যাপারটা বন্ধ করেছে।

লী পো বললেন, জানি, সেইজন্যই তো ঝিলমের নামে বিশ্বশান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিন্তু ঝিলম কী করে পোড়া মিডাস নক্ষত্রে থামল, সেখানকার সাংঘাতিক হিংস্র লোকদের দমন করল, সেটা শুনেছেন কি?

না, পুরোটা শুনিনি!

আপনার কি একবারও মনে এই প্রশ্ন জাগেনি যে ঝিলম একা-একা কী করে এই অসাধ্য সাধন করল?

তোমরাও সাহায্য করেছ তাকে। ঝিলম-দুঃসাহসী।

আমরা কিছুই করিনি। সবকিছুই করেছেন মহাত্মা হো-সান!

মহাত্মা হো-সান? কী বলছ তুমি ইউনুস? তিনি এখনও বেঁচে আছেন!

এই মুহূর্তে বেঁচে আছেন কিনা জানি না। আমরা যখন তাঁকে শেষ দেখি, তখন তার বয়েস একশো বিরাশি বছর। স্বাস্থ্য বেশ ভালো, বুদ্ধিও পরিষ্কার। তিনি আরও বেশ কিছুদিন বাঁচবেন আশা করা যায়।

কিন্তু ঝিলমকে তিনি কীভাবে সাহায্য করলেন?

আপনি জানেন, মহান বিজ্ঞানী হো-সান নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। তার নিজস্ব একটা শূন্য যান আছে, সেটাতে আর কেউ থাকে না। খাবার-দাবার কিছুরই তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি কোথায় কখন ভেসে বেড়ান তা কেউ জানে না।

তিনি ঝিলমকে কী করেছেন! বলো-বলো, ইউনুস, আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।

মিডাস নক্ষত্রে অভিযান চালানোর আগে আমরা হোসানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ঝিলমকে খুব ভালোবাসেন। ঝিলমকে তিনি ডাকেন ‘দুষ্টু ছেলে’ বলে। রা-কে উনি নিজের মেয়ের মতন মনে করেন। তাই আমরা গিয়েছিলাম ওঁর আশীর্বাদ চাইতে।

আসল কথাটা বলল, ইউনুস।

সবটা খুলে না বললে আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনি কি জানেন, হো সান এমন একটা শক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন, যেরকম শক্তির কথা কেউ কখনও শোনেনি?

না, জানি না তো!

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে হোসান মহাবিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন যে আর কেউ যেন কোনওরকম অস্ত্র না বানায়। মানুষ আর মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের লড়াই হবে না।

এসব তো পুরোনো কথা। অনেকেই হোসানের কথা মানেনি। অনেকে বলেছিল, মানুষে-মানুষে লড়াই না হলেও মহাশূন্যের কত গ্রহ-নক্ষত্রে অন্য অনেকরকম সাঙ্ঘাতিক প্রাণী থাকতে পারে। তাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য অস্ত্র বানাতেই হবে।

মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বা বুদ্ধিমান কোনও প্রাণীর খোঁজ কিন্তু এখনও পাইনি। কমিক স্ট্রিপে কিংবা টেলিভিশনের ছোটদের নাটকে নানারকম অতিকায় অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণী দেখানো হয় বটে, কিন্তু আপনি তো মহাশূন্যে চড়ে বেড়িয়েছেন, আপনি যে কোনও ড্রাগন কিংবা মাকড়সা কিংবা ইঁদুরমুখো মানুষ দেখেছেন?

না, দেখিনি। মহাশূন্যে আমরা অন্য কোনও প্রাণীর সন্ধান এখনও পাইনি, তা ঠিক।

হোসানের কথা বৈজ্ঞানিকরা শুনলেন না বলেই তো তিনি রাগ করে নির্বাসনে চলে গেলেন। সেখানেও কিন্তু তাঁর গবেষণা থেমে যায়নি। তিনি এমন একটা শক্তি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন, যেটা হবে সমস্ত অস্ত্রের চেয়ে বেশি জোরাল।

তার মানে, আর একটা অস্ত্র।

না। সেই শক্তি দিয়ে অন্য কারুকে মারা যাবে না। কিন্তু প্রতিরোধ করা যাবে। যে মানুষ সেই শক্তিটা পাবে, কোনও অস্ত্রই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। তাকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেও সে পুড়বে না। বাজুকা দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার গায়ে আঁচড় লাগবে না। এমনকী নিউক্লিয়ার পাওয়ার দিয়েও তাকে একচুল সরানো যাবে না।

লী পো চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে হতাশভাবে বললেন, এসব তুমি আমাকে কী শোনাচ্ছ ইউনুস? এইজন্য আমাকে ডেকে আনলে? এ কখনো সম্ভব?

ইউনুস লী পো-র হাতটা চেপে ধরে ব্যগ্রভাবে বলল, সার আপনি কথাটা শুনুন। যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, হো-সান তাও বাস্তবে পরিণত করতে পারেন।

কিন্তু এরকম শক্তিও তো খুব বিপজ্জনক। এরকম শক্তি যদি কেউ পায়, তাহলে সে তো সমস্ত মানুষের ওপর প্রভুত্ব করতে চাইবে। সে হবে মহাবিশ্বের ডিকটেটর। আগেকার দিনে যাকে ভগবান বলত।

না। হো-সান সেদিকটা চিন্তা করেছেন। এই শক্তি শুধু তো শরীরের পরিবর্তন ঘটায় না। মনেরও পরিবর্তন ঘটায়। এই শক্তি যে পাবে, কোনও মানুষের ক্ষতি করার চিন্তা তার মনেই আসবে না। সে রাজা হতে চাইবে না। কারুর ওপর আধিপত্য করতেও চাইবে না।

হো-সান কি সত্যিই এইরকম শক্তি আবিষ্কার করেছেন।

হ্যাঁ করেছেন। তবে এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে আছে, কোনও মানুষের ওপর তো সেটা পরীক্ষা করতে হবে। তিনি সেটা করতেই ভয় পাচ্ছিলেন।

নিজের ওপর করছিলেন না কেন?

নিজের ওপর করলে যদি কোনও গোলমাল হয়, তা হলে আর শোধরাবার উপায় থাকবে না।

তা ঠিক।

ঝিলমকে তো জানেন, ও কী রকম পাগল? ঝিলম একরকম জোর করেই বাধ্য করিয়েছে তাঁকে।

সেইজন্যই ঝিলম ওইরকম হয়ে গেছে?

সেই প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে ঝিলম একা মিডাস নক্ষত্রে নামল। আমরা ওপর থেকে দেখছিলুম। সেখানকার লোকগুলি কী সাঙ্ঘাতিক তা তো আপনি জানেন। অনেক রকম উন্নত অস্ত্রও ওদের ছিল। ঝিলমকে ওরা কিছুতেই ধ্বংস করতে পারল না। শেষপর্যন্ত ওরা ভয় পেয়ে ঝিলমকে মনে করল কোনও দেবতা।

এখানেও অনেকেই তা ভাবছে।

মিডাস নক্ষত্রের অভিযানে তো ঝিলম সার্থক হল। তার পরেই শুরু হল গন্ডগোল। আগেই বলেছি, জিনিসটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে ছিল, এর কী কী সাইড এফেক্ট হতে পারে, তা দেখা হয়নি। দু-এক দিনের মধ্যেই ঝিলম-এর স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল। সে আমাদের চিনতে পারে না। বোধহয় ও কানেও শুনতে পায় না এখন। তারপর ও গা থেকে আগুনের শিখা বেরুতে লাগল। আগেকার দিনে বিভিন্ন ধর্মের ভগবানের ছবিতে যেসব মূর্তির মাথা বা শরীর ঘিরে একটা জ্যোতি দেখা যেত, অনেকটা সেইরকমই হয়! তা হলে কি ঝিলম ভগবানই হয়ে গেল?

লী পো এক ধমক দিয়ে বললেন, কীসব বাজে কথা বলছ, ইউনুস। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এসব কথা তোমার মাথায় আসে? ভগবান বলে কিছু আছে নাকি? ভগবান তো মানুষের একটা সুন্দর কল্পনা। আমরা মহাশূন্যে তোলপাড় করে খুঁজে দেখেছি। ভগবান বা দেবতা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। ঝিলম-এর এই অবস্থা হয়েছে, ওকে আবার হোসানের কাছে নিয়ে যাওনি কেন? ঝিলম তো যেতে চাইছে না?

ইউনুস দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, না জেনারেল, দোষ হয়তো আমারই। আমি শত চেষ্টা করেও হো-সানকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। যে গোল বুদবুদটায় তিনি থাকেন, সেটা যে এখন কোথায় তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। ঝিলম সুস্থ থাকলেও সে হয়তো খুঁজে বার করতে পারত। আমি কিংবা রা কিছুতেই পারিনি। কোটি-কোটি কিলোমিটার আমরা ঘুরে বেরিয়েছি, আমাদের খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমরা না খেয়ে থেকেছি। কিন্তু রকেটটা আর ধকল সহ্য করতে পারছিল না। খুব সম্ভবত মেটাল ফেটিননা আমাদের কম্পিউটার অচল হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় আমরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি।

লী পো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে এক্ষুনি তো ঝিলমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ঝিলমকে যে ধরাই যাচ্ছে না। ও যদি চিকিৎসা করতে রাজি না হয়?

ইউনুস বলল, সে ব্যবস্থা করা যাবে। ঝিলমের মধ্যে একখানা একটা মানবিক ব্যাপার আছে। ও একটানা বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারে না। এক সময় ও ঘুমিয়ে পড়বে। তখন দেখবেন, ওর শরীরটা তুলোর মতন হালকা। একটা বাচ্চা ছেলেও ওকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে।

.

০৪.

এ পর্যন্ত যত রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছে, সেই সবের থেকেও মানুষের মন যে কত বেশি শক্তিশালী তা বোঝা যায় কয়েকজন মানুষকে দেখে।

কে সেইরকম একজন মানুষ।

কে'র পুরো নাম কেউ জানে না, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তার জন্ম তাও সে বলে না। বেঁটে-খাটো ছোট্ট চেহারার মানুষ মাথায় চকচকে টাক, গায়ের রং ফরসা। কে এখানকার একটি হোটেলের ম্যানেজার।

তার এমন একটা গুণ আছে যে কোনও কম্পিউটারও এপর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেনি।

ঘুমন্ত ঝিলমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পাঁচ জন বড়-বড় ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু ঝিলমের শরীর থেকে ঠান্ডা আগুনের শিখা কেন বেরুচ্ছে তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। এক্সরে-তে ঝিলমের শরীরের ভেতরের কোনও ছবিই উঠল না।

পাঁচজন ডাক্তারই স্বীকার করলেন, এ যা দেখছেন, তা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। কোনও মানুষের শরীর যে এরকম হতে পারে তা তাঁরা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না।

এখন হো-সানকে খুঁজে বার করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

এক হাজারটা মহাশূনে কেন্দ্রে খবর পাঠানো হল। কেউ হো-সান-এর কোনও সন্ধান দিতে পারল না। তিনি ইচ্ছে করেই কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না।

তখন লী পো আর ইউনুস হো-সান-এর একটি ছবি নিয়ে এল কে-র কাছে।

কে কাউন্টারে বসে হিসেব মেলাচ্ছিল। ওদের দেখে হাসিমুখে বলল, শুভ সন্ধ্যা! সুন্দর জীবন! আবার কার খোঁজ পড়ল?

লী পো বললেন, মাননীয় কে, আপনার সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করি। একটা বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।

হাতের ছবিটা তুলে ধরে লী পো জিগ্যেস করলেন, এই মানুষটি কোথায় আছে আপনি বলতে পারেন? ইনি বেঁচে আছেন না মরে আছেন?

কে কয়েক পলক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছবিটির দিকে।

তারপর বলল, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। এই ছবির চেয়েও ইনি এখন অনেক বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। বেঁচে আছেন। সাবানের ফেনা দিয়ে যেরকম বুদবুদ হয়, ইনি সেইরকম একটা গোল স্বচ্ছ জিনিসের মধ্যে রয়েছেন। তার মধ্যে বাড়ি আছে, বাগান আছে। ইনি শুয়ে আছেন খাটে। মোষের শিং-এর মতন একটা কিছু। সেটাতে উনি ফুঁ দিচ্ছেন, তাতে শব্দ হচ্ছে।

ইউনুস লী পোর হাত চেপে ধরে বলল, ইনি ঠিক বলেছেন, ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন। হো-সান মোষের শিং-এর ভেঁপু বাজান মাঝে-মাঝে।

লী পো বললেন, মাননীয় কে, এই বুদবুদটা কোথায়? তার অবস্থানটা বলতে পারেন?

কে হেসে বলল, ওইটা তো আমি বলতে পারব না। আমি অঙ্কে বড্ড কাঁচা। তবে দূরত্ব দেখে মনে হচ্ছে আমাদের চেনাশুনো কোনও গ্রহের কাছাকাছি নয়। ওখানে আকাশের রং সাদা।

যাক, তবু জানা গেল হোসান বেঁচে আছেন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় কী এখন?

সমস্ত মহাশূন্য স্টেশন থেকে বেতার তরঙ্গে বহু ফ্রিকোয়েন্সিতে খবর পাঠানো হতে লাগল। যদি হোসানের কাছে পৌঁছয়। কিন্তু কোনও সাড়া এল না। হোসান এমনিতেই কারুর সঙ্গে সংযোগ রাখতেই চান না।

আর একটা শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে।

ইদানীং দেখা গেছে চর্চা করলে মনের শক্তি অনেক বাড়ানো যায়। বেতার তরঙ্গ, যতদূর পৌঁছয় তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি আর অনেক দূরে পাঠানো যায় মানসিক তরঙ্গ।

খুব মন দিয়ে একজনের কথা চিন্তা করলে সে অনেক দূরে থাকলেও তা টের পেয়ে যায়। কারুর কারুর এই মানসিক শক্তি অনেক বেশি হয়। ট্রেনিং নিলে মনের এই শক্তি বহু গুণ বাড়ানো যায়। এই ট্রেনিং-এর জন্য অনেকগুলি কলেজ খোলা হয়েছে।

মেয়েদেরই এই শক্তি বেশি হয়। অন্য একটি স্টেশন থেকে ডেকে আনা হল মার্থা আর ভারতাঁকে।

তারপর কে, মার্থা আর ভারতাঁকে বসানো হল হাসপাতালের একটি ঘরে। পাশেই শুয়ে আছে ঝিলম। সে এখন ঘুমুচ্ছে, তবু সারা শরীর থেকে বেরুচ্ছে আগুনের হলকা।

কে শুধু দেখতে পায়, কিন্তু মানসিক বার্তা পাঠাতে পারে না। মার্থা আর ভারতী চোখ বুজে ঠিক ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে আছে।

এক ঘণ্টার বেশি কেটে গেল, কেউ একটাও কথা বলল না। ইউনুস, রা আর। নী দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ওরা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

রা ফিসফিস করে বলল, ইউনুস আমি একটা কথা ভাবছি। হো-সান ওইরকম একটা পরীক্ষামূলক শক্তি ঝিলমের ওপর ব্যবহার করলেন, তারপর তার ফলাফল কী হল সেটা তিনি জানতে চাইলেন না? ঝিলমের যে কোনও বিপদ ঘটতে পারে, সেটা তিনি ভাবেননি?

ইউনুস বলল, ঝিলম তো ইচ্ছে করেই, বলতে গেলে জোর করেই ওটা নিয়েছে।

তবু উনি ঝিলমের জন্য চিন্তা করবেন না? এটা কখনো হতে পারে?

উনি হয়তো ভেবেছেন, আমরাও যাব ওঁর কাছে। আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলব সেটা উনি বুঝবেন কী করে?

আমাদের দেরি হচ্ছে দেখে উনি নিজেই আমাদের খোঁজ করতে পারতেন। হয়তো উনি খুব অসুস্থ!

এর মধ্যে ভারতী বলে উঠল, সাড়া পাচ্ছি। হো-সান আমার কথা শুনতে পেয়েছেন।

কে বলল, হো-সান বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উনি জল খাচ্ছেন।

ইউনুস বলল, ভারতী, তুমি ওকে ঝিলমের কথা জানিয়েছ?

ভারতী কোনও উত্তর দিল না। সে সম্মোহিতের মতন হয়ে আছে। সে অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তার ঠোঁট নড়ছে।

কে বলল, হোসান এদিকেই তাকালেন। তার মুখে হাসি।

কে তাকিয়ে আছে সাদা, দেয়ালের দিকে। অথচ সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সিনেমার পরদায় ছবি দেখতে পাচ্ছে।

ভারতী আবার বলে উঠল, মহাত্মা হো-সান, আপনি ঝিলমকে ডাকছেন? আপনি কোথায়? ঝিলম অত দূর যাবে কী করে?

কে বলল, হোসান হাত তুলছেন। তাঁর হাতে একটা চকচকে পাথর।

ইউনুস বলল, ওটা ওঁর ক্রিস্টাল সেট। ওটা থেকে তিনি গান-বাজনা শোনেন।

ভারতী আবার বলল, হো-সান আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনি কোথায়? আপনি কোথায়?

কে বলল, হোসান হাসছেন। উনি আমাদের কথা শুনে মজা পাচ্ছেন মনে হল।

রা কান্না-কান্না গলায় বললেন, আপনারা কেউ ওঁকে বলুন, ঝিলমের সাংঘাতিক বিপদ। ও আমাদের চিনতে পারছে না। ওর গায়ে আগুন জ্বলছে।

এই সময় ঝিলম ঘুম ভেঙে উঠে বসতেই সবাই চুপ করে গেল।

ঝিলম ঘরের সবার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি শান্ত। উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত দুটোকে প্রার্থনার ভঙ্গিতে ওপরে তুলল। তার সারা শরীরে আগুনের শিখা এমন লকলক করে উঠল যে সেদিকে আর চোখ রাখা যাচ্ছে না।

ঝিলম পরিষ্কার গলায় বলল, আমায় যেতে হবে? আমি যাচ্ছি!

এবারে ভারতী নামের মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল ঝিলমের দিকে। তার চোখ বন্ধ। সে ফিসফিস করে বলল, ঝিলম, আমি হোসান বলছি। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে!

রা ইউনুসের হাত চেপে ধরল। ভারতীর গলা দিয়ে হোসান কথা বলছেন।

ঝিলম বলল, গুরুদেব, আমি ভয় পাইনি। আমি জানতাম, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন।

ভারতী বলল, ঝিলম, তোমার মেটামরফোসিস হয়ে গেছে, তুমি আর সাধারণ মানুষ রইলে না। যে প্রচণ্ড শক্তি তোমার মধ্যে ঢুকেছে, তা দিয়ে তুমি বিশ্ব জয় করতে পারো। তুমি কি তাই-ই চাও?

বিলম বলল, না গুরুদেব, আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমার মনে হয়, আমার সব আছে।

ভারতী বলল, ঝিলম, তোমার আর কোনওদিন ক্ষুধা বা তৃষ্ণাও পাবে না। তুমি সবসময় পরিপূর্ণ। কিন্তু তুমি আর মানুষের মধ্যেও থাকতে পারবে না। তোমার শরীর ক্রমশ আগুনের মতন জ্যোতিতে ছেয়ে যাবে। মানুষ তোমার দিকে তাকাতে পারবে না। তুমি চলে এসো!

ঝিলম বলল, কোথায়?

ভারতী বলল, ঝিলম, তুমি আমার উত্তরাধিকারী। আমার আয়ু আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। তুমি আমার এই বুদবুদে চলে এসো। তুমি একা থাকলেই তোমার শক্তি আরও বাড়বে!

ঝিলম বলল, আমি আসছি।

রা ছুটে এসে বলল, না ঝিলম, তুমি যেও না। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?

ভারতী আস্তে-আস্তে বসে পড়ল, তারপর চোখ খুলে বলল, আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না। কে বলল, হোসান শুয়ে পড়েছেন। দুহাতে মুখ চাপা দিয়েছেন।

ঝিলম বলল, আমি আর দেরি করতে পারছি না!

রা বলল, ঝিলম-ঝিলম, আমি রা। আমাকে চিনতে পারছ না? ঝিলম বলল, হ্যাঁ আমি তোমায় চিনতে পারছি। তোমার নাম রাভী? ডাক নাম রা। কিন্তু আমি আর ঝিলম নই। ঝিলমের চোখ, কান, নাক, মগজ কিছুই আর আমার নয়। আমি এখন আর মানুষ নই।

রা বলল, তা হলে তুমি কী?

ঝিলম বলল, আমি একটা ইচ্ছাশক্তি। সেই জন্যই আমাকে আর কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

রা বলল, তুমি চলে যাচ্ছ, আমরা তোমাকে আর দেখতে পাব না?

ঝিলম বলল, আমি ফিরে আসব। মাঝে-মাঝেই ফিরে আসব। আমি তো সমস্ত মানুষেরই ইচ্ছাশক্তি!

ঝিলম বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। সবাই চলে এল তার পেছন-পেছন।

দূর থেকে জেনারেল লী পো ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, কী হল, হো-সান এর সন্ধান পাওয়া গেল?

ইউনুস বলল, হ্যাঁ। ঝিলম আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

জেনারেল লী পো বললেন, না, না, ও কোথায় যাবে! আমি রাষ্ট্র সঙেঘর হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠিয়েছি। সেখান থেকে বাছাই করা একটা মেডিক্যাল টিম পাঠাচ্ছে, তারা ঝিলমকে পরীক্ষা করে দেখবে।

ঝিলম তার দিকে তাকিয়ে বলল, জেনারেল, বিদায়, আমি চলে যাচ্ছি! লী পো বললেন, ঝিলম, তুমি আমায় চিনতে পেরেছ? যাক নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার এখন কোথাও যাওয়া হবে না। সব গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কোনও রকেট তোমাকে নেবে না। তোমার নিজের রকেট খারাপ হয়ে আছে।

ঝিলম হাসল। আবার তার হাসিতে ঝলসে উঠল আগুনের শিখা। কিন্তু সে খুব নরম গলায় বলল, আর আমার রকেটের দরকার হবে না। আমাকে যেতে হবে হো সানকে বাঁচিয়ে তুলতে।

এক মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতন ব্যাপার হল। সবাই চোখ বুজে ফেলল। তারপর চোখ মেলতেই দেখা গেল ঝিলম সেখানে নেই।

রা বলল, ওই যে, ওই যে ঝিলম আকাশে উড়ে যাচ্ছে!

লী পো ওপরের দিকে তাকিয়ে মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, মাই গড! একজন মানুষ, কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়াই উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে? এ কোন বিজ্ঞান?

ক্রমশ ছোট হতে হতে একটা বিন্দু হয়ে মহাকাশে মিলিয়ে গেল ঝিলম।